অশুভ চর্বিতচর্বণ আর কতদিন প্রয়োজন হবে?

চর্বিতচর্বণ শব্দটা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগে না, কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় 'জাবর কাটা' শব্দটা শুনতে অনেকটা তিক্ত-বিস্বাদ শোনায়। তখন বলতে হয় 'পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা'। এটা আমাদের অদৃষ্টের লিখন, বারবার একই কথা লিখতে হয়। 'ভাগ্য' বিষয়টা যত বয়স হচ্ছে তত বেশি মানতে বাধ্য হচ্ছি। গত নিবন্ধে লিখেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর জাতীয় সংগীত গাইতে গর্ব ও আশায় বুকটা দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো, এখন অনেক বছর থেকেই তা আর ওঠে না। যদিও ধানে, মানে, প্রিয়জনের টানে-ভরা এই সীমাহীন সবুজের মাঝখানে জন্মে বারবার বিরক্তিকর কোনো গানে জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবো কোন ধ্যানে! জীবনে এই দেশ ছেড়ে তো অন্য কোথাও গিয়ে বারবার ফিরে আসতে হয়। জানি না কিসের টানে এটা হয়! আবার এসে অপ্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয়, কারো কাছে খারাপ হতে হয়, চর্বিতচর্বণ করতে হয়। কিসের মোহে? কেন এত পুনরালোচনা? এটা কেউ বোঝে না, কেউবা বুঝেও না বোঝার ভান করে।

আমি সাধারণত কোনো তত্ত্বকথা লিখতে চাইনে; বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে অপ্রিয় সত্য কথা লিখি, যে লেখায় অনেকের গা জ্বালা করে। এ সংসারে কেউ না কেউ তো কারো বিরাগভাজন হবেনই। একজন মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারেন না। 'উচিত কথায় খালু বেজার' তো হবেনই। লালন গেয়েছেন, অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে চাতক স্বভাব না হলে'। সেই চাতক স্বভাবধারী লোকদেরকে তো সামনে এগিয়ে আসতে দেখি না, সেজন্য দেশের ভাগ্যে 'অমৃত মেঘের বারি'ও জোটে না। তাই 'ফুয়াদের গল্প বলা'র মতো জিজ্ঞেস করতে হয় 'এই ফুড়ুৎ আর কতক্ষণ চলিবে'? 'যতক্ষণ চড়ুই পাখি আসা-যাওয়া করিবে।' তখনই প্রশ্ন জাগে, 'চড়ুই পাখি কি জীবনে আসা-যাওয়া কখনো বন্ধ করিবে'? এমন বেওয়ারিশভাবে একটা দেশ বেশিদিন চলতে পারে না। কেউ কেউ দেশটা নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করে, কিন্তু কাজের বেলায় লবডঙ্কা।

আমাদের পাশের গ্রামের রহম পাগলার গল্প তো প্রায়ই বলি। সে প্রথমে খারাপ পাঁড়ায় খুব যেত। অবশেষে কেউ হয়তো কথা দিয়ে কথা না রাখায় মাথা বিগড়ে যায়। তারপর রহম আলী রহম-পাগলা নাম ধারণ করে। পথে পথে মাথা নিচু করে শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে এই বলে গান করে বেড়াতো, 'সখি আমার মাথা গেল ঘুরে, সখি ...'। খারাপ পাঁড়ার কেউ কেউ খারাপ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ চালকদের কথার মূল্য থাকবেনা কেন? দেশচালকদের কাজ-কারবার ও স্বভাব দেখলে আমাদের মাথা ঘুরে যায় কেন? তাহলে আমরা কি দেশচালকদের খারাপ পাঁড়ার সাথে তুলনা করবো? গত নির্বাচনে তো তাই-ই দেখলাম। বেশি টাকার লোভে বেসরকারি অনেকেই তো নীতি-নৈতিকথা ভুলে ক্ষমতাসীন দলের হাতে ধরা দিলো। টাকা কিংবা পদের লোভে বলতে থাকলো, 'সখি আমার মাথা গেলো ঘুরে'। টাকা দিয়ে অনেক দেশচালক কেনা যায়। এখনো তো বিরোধী শিবিরের অনেক 'মাথা ঘোরা' অজানা কাহিনী বেরিয়ে আসছে। পরিস্থিতি উল্টো হলে উল্টো ঘটনাও ঘটতো, নিশ্চিত জানি। এই শেষ বয়সে এসে দেখছি এদেশের প্রতিটা জনপদে, দেশব্যাপী এই অসৎ, কথা-না-রাখার দলে লোক বেশি; বিশেষ করে দেশের হর্তাকর্তারা, তাদের সাগরেদরা; অফিস-আদালতের সুযোগ্য (?) পদধারীরা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে প্রতিনিয়ত বিক্রি হচ্ছে। দেশ নিয়ে তারা স্বার্থের গেম খেলতে বসেছে। সব কিছুই উদ্দেশ্য-বিচ্যুৎ হয়ে গেছে; দেশের স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে। শেষমেষ এদেশের সাধারণ মানুষকে কি সেই রহম পাগলার পরিণতি ভোগ করতে হবে? রহম আলী তো পাগল ছিল না, কেউ না কেউ ঘটনা ঘটিয়ে রহম-পাগলা বানায়। দেশপরিচালকরা তো এদেশের সাধারণ মানুষের সব স্বপ্ন আকাশের নীলিমায় উধাও করে দিয়ে গোষ্ঠী-স্বার্থের ডামাডোল বাজাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে। দোহাররা সুযোগ বুঝে কোরাস ধরেছে। তালে তালে দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

এবার পত্রিকার পাতা থেকে কিছু চর্বিতচর্বণ করি। 'দখলে লাইনম্যান নেতা পুলিশ মস্তান– ফুটপাথে মিলেমিশে চাঁদাবাজি' (২১.৩.'২৪)। 'বায়ুদূষণের শীর্ষে বাংলাদেশ– উৎস চিহ্নিত, প্রতিকারে নেই কার্যকর উদ্যোগ' (২১.৩.'২৪)। 'হকার থেকে কোটিপতি অনেকে– নিউমার্কেট সায়েন্সল্যাব চাঁদাবাজদের স্বর্গরাজ্য' (২১.৩.'২৪)। 'ঠেকায়ে কারও কাছে কিছু নেইনি, কাউরে উপকার করে যদি...'– এসআই ওবায়েদুর রহমান (২১.৩.'২৪)। 'জাল-জালিয়াতির প্রভাব– গ্রাহক কমছে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে' (২০.৩.'২৪)। 'পথে বসেছে লাখো বিনিয়োগকারী' (২০.৩.'২৪)। 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান–

বড় ঋণ জালিয়াতরা কি ইচ্ছাকৃত খেলাপি?' (১৯.৩.'২৪)। 'ভুয়া ভাউচারে অর্থ লোপাট– ফুলছড়িতে এডিপির কাজ ভাগবাঁটোয়ারা' (১৯.৩.'২৪)। 'চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ-রায়পুর আঞ্চলিক সড়ক– নির্মাণের ছয় মাস না পেরোতেই উঠে যাচ্ছে পিচ' (১৯.৩.'২৪)। এগুলো মাত্র তিন দিনের কয়েকটা খবর। পুরোটাই যুগান্তর থেকে চর্বিতচর্বণ। খবরগুলো দুর্নীতিতে ভরা। দেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিস্তারিত পাঠকরা নিশ্চয়ই পড়েছেন। অন্য আরো দশটা পত্রিকা ঘাটলে এই তিন দিনে হাজারে হাজার এ ধরনের খবর পাবেন, যার নাম দিতে পারেন 'হাজার রাতের কেচ্ছা'। এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে, দেশের পরিণতির কথা ভাবলে আপনাদের মাথা রহম-পাগল হতে বাধ্য। দেশের সাধারণ মানুষ অনন্য সাধারণ রাজনীতিক, সরকারি বিভাগগুলো ও অসৎ ব্যবসায়ীদের কাছে দেশটা যেন দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে লিজ দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, মূল গলদটা কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ওষুধে দেখেছি রোগ নির্ণয় সঠিক হলে এক ওষুধের ব্যবহারে পাওয়ার বাড়াতে বাড়াতে একসময় রোগমুক্তি ঘটে। আমরা এই তেপ্পান্ন বছরেও সঠিক ওষুধটা চিনতে পারলাম না কেন ? অথচ অনেকবার ডাক্তার বদল করলাম। তাহলে আমরা কি রোগ পুষে রাখতে চাই? না কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের মতো রোগ দেখিয়ে কামাই-রোজগার করার জন্য রোগের মূল চিকিৎসা এড়িয়ে যায়?

'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে দেখেছি কোনো কোনো মানুষের স্বভাবে অন্ধকার কোনোদিনই দূর হয় না, অন্ধকার দূর করার ইচ্ছাও তাদের থাকে না– তাতে তার আয়-রোজগারে ও মানসিকতার ব্যত্যয় ঘটে। এ গল্প ছাড়াও বানু মোল্লা তার সায়েরিতে বলেছেন, 'যার যে স্বভাব দোষ না যায় কখন, হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। আমরা যতই লুটেরা শ্রেণির স্বভাব পরিবর্তনের কথা বলি না কেন, তা প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। বরং আমরা জানি, একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো সবসময় একজায়গায় জড়ো হয়। আমরা বারবার ভিন্নরঙা বনবিড়ালের কাছে মুরগি পোষানি দিচ্ছি। একবারও অতি কষ্টে অর্জিত মুরগির ভাগ্যে কী ঘটবে তা ভাবি না। আমাদের কোষাগার খালি হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সম্পদ জনসাধারণের কাজে ব্যয়িত হচ্ছে না। বেশিরভাগ বনবিড়ালে খেয়ে যাচ্ছে। এটাই আমাদের ব্যর্থতা, যাকে আমরা 'অদৃষ্টের লিখন' বলে চালিয়ে দিই।

এত কথা লিখছি শুধু এ মাসের গুরুত্ব বেশি বলে। মাসটা স্বাধীনতা ঘোষণার মাস, গণহত্যার মাস, ৭ মার্চের মাস, এই মার্চকে ঘিরেই আমাদের সব স্বপ্ন, জীবনের চাওয়া-পাওয়া। এই তেপ্পান্ন বছরে আমাদের এ দশায় ধরলো কেন? যাদের উপর দেশ ও সমাজের উন্নতি নির্ভরশীল, সেসব মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, মানবসেবা, দেশপ্রেম হারিয়ে গেল কেন? কারো কি বিশ্বাস হয়, এ গুণগুলো তাদের মধ্যে আবারও ফিরে আসবে? ব্যতিক্রম বাদে সবাই আত্মসেবা ও গোষ্ঠীসেবায় মত্ত। জানি রোজার মাস চলছে। গোপনে রান্নাঘরে ঢুকে দিনের বেলায় অনেকেই খাবার খেয়েও রোজা রেখেছি বলতে পারে, যদিও তা কেউ বলে না। আল্লাহ সব কিছু দেখেন সে-ভয়ে, না কি এটা আমাদের সংস্কৃতি, না কি ইবাদত কবুল হবে না ভেবে? সমাজে খারাপ কাজ করলে, মজুতদারী করলে, জনগণের টাকা লুটপাট করে টাকার পাহাড় গড়লে, ঘুস খেলে, মিথ্যা বললে, দেশের মানুষকে শোষণ করলে, মানুষকে ফাঁকি দিলে, চুগোলখোরি করলে, দুর্বৃত্তায়ন করলে তখন কি আল্লাহ দেখেন না? তখন ইবাদতের উদ্দেশ্য কোথায় থাকে? শুধু রোজা রাখার সময় আল্লাহর ভয় আসে কোত্থেকে? বিভিন্ন কুকর্মের ফলে ইবাদত কি আসলেই ঠিক থাকে? হারাম উপায়ে অর্জিত উপার্জনে শরীরে রক্ত তৈরি হলে, মুখের কথার কোনো মূল্য না থাকলে, কুচক্রি মনোভাব হলে সে ব্যক্তির ঐ মুখ-দিয়ে-বলা কথা ও শরীরের মাধ্যমে ইবাদত কি কখনো কবুল হয়? এসব কথা তো আমরা সবাই বুঝি ও জানি, জানা মতো কাজ করি না কেন? এত খারাপ কথা বলছি রোজা ও ইফতারের বাজারে এবং রাজনীতির বাজারে হিড়িক দেখে। আল্লাহর সাথে চালাকি করা দেখে; প্রতিদিনের পত্রিকা পড়ে।

আমাদের সমাজে আমরা অনেক কিছুই ব্যাপকহারে লৌকিকতা ও লোক-লজ্জার কারণে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিজ স্বার্থের কারণে নিজের পশুসদৃশ আসল রূপকে গোপন করছি। আমরা সাধু সাজি, কিন্তু আত্মত্যাগ ও আত্ম-সংযমের সময় এলেই সাধু থাকি না, কপটতা ধরা পড়ে। আমাদের মুসলমানিত্বে নিশ্চয়ই ভেজাল আছে। আমি কোনো কোনো বিষয়ের ভালো ভালো দিক তুলে ধরে সওয়াবের ভাগিদার হতে পারি না বলে দুঃখিত। গোলেমালে হরিবোল দিতে না পারা আমার বদভ্যাস। এজন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই যে আমি অধিকাংশ লেখায় রাজনীতিকদের অবিরাম ধোলাই করি, বিষোদগার করি, তাদের ওপর দেশের অনুন্নতি ও লুটের দোষ চাপাই, বিষয়টা আসলে সে-রকম নয়। আমি দোষারোপ করি রাজনীতিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকৃত পরিবর্তনকে। অধিকাংশ রাজনীতিক তাদের বাঞ্ছিত গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারেনি, বরং পতন হয়েছে, যার কারণে দেশ ও সমাজ দীর্ঘবছর ধরে ভুগছে। দেশটা ক্রমেই রাজনীতির ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। ভোগান্তির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। তাই বিষয়টা না লিখে, প্রকাশ না করে গত্যন্তর নেই। কবি নজরুল লিখেছিলেন, 'হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ! বন্ধু ওগো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে! দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে'। আমরা অসহায়; কাউকে না কাউকে তো এটা বলতে হবে। রাজনীতির পদ, পদবী, প্রার্থিতা পেতে, দল বদল করতে টাকার খেলা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। দিনে দিনে এখন মহীরুহ ধারণ করেছে, প্রকাশ্যে চলে আসছে, অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি হচ্ছে। এটা তো এদেশের সাধারণ মানুষের চোখের সামনে হচ্ছে। তবে বিভিন্ন দলের কেউ কেউ আছেন যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, এটা আমারও জানা। তারা তো এ অধঃপতনের স্রোত বন্ধ করতে পারছেন না। তারা হয়ে গেছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই ব্যবসায়ী রাজনীতি এমনকি তাদেরকেও গ্রাস করছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে পরিণতি অনেক ভয়াবহ হবে। এ জন্যই আমার এ বিষোদগার। আমাদের পরে স্বাধীনতা অর্জন করেও বেশ কিছু দেশ তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। এটা শুধু তাদের সফল নেতা-নেতৃত্ব ও সামাজিক উন্নত বৈশিষ্ট্যের গুণে। এটা মানতেই হবে।

সময় এসেছে বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করার। শুধু দেশ ও সমষ্টিগত মানুষের স্বার্থে অসৎ, দুর্নীতিবাজ, ফেরেববাজ, ধাপ্পাবাজ, চাটুকার, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, লুটেরা ব্যবসায়ী, ঘুসখোরদের পরিত্যাগ করা, তা তারা যত শক্তিশালীই হোক। সৎগুণের রাজনীতিকদেরই বিষয়গুলো আমলে নিতে হবে। শুধু নেতৃত্বের সততা, দেশপ্রেম, মুল্যবোধ, আধিপত্যবাদের দোসরমুক্ত একদল রাজনীতিকই পারেন আবার নতুন উদ্যোগে দেশ গড়া শুরু করতে। এদেশে সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, দেশ চালাতে সক্ষম যোগ্যতাসম্পন্ন অসংখ্য মানুষ চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় আছে, যারা সাথে থাকলে বিজয় অনিবার্য। তখনই হবে মার্চ মাসের স্বপ্নের প্রকৃত বাস্তবায়ন। এক যাত্রা প্যান্ডেলে বিবেককে টানা সুরে গাইতে শুনেছিলাম, 'পথিক আপন বুঝে চলো-ও, এ-এ-এই বেলা-আ'।

(২৭ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ